আমার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আমি

গৌতমকুমার পাল

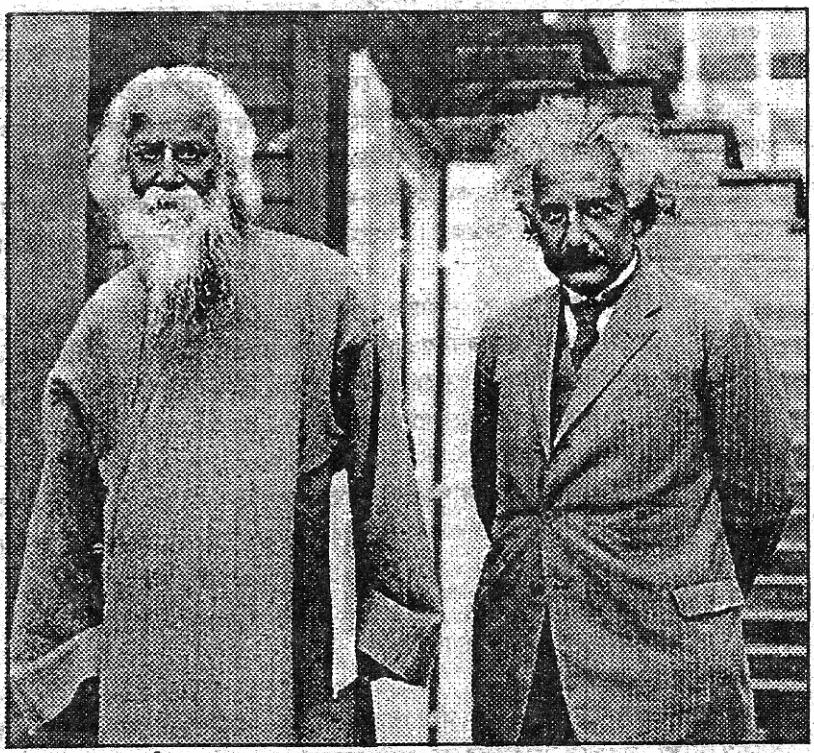

আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনও প্রবন্ধ লিখতে। প্রথমে ইচ্ছাও জেগেছিল রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা নিয়ে বেশ গুছিয়ে একটি রাশভারী প্রবন্ধ লেখার। পরে ভেবে দেখলুম আমার চেয়ে ঢের যোগ্যতর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভূরি ভূরি প্রবন্ধ লিখেছেন গত একশো বছরে আর তার মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে লেখা নেই এটা হতে পারে না। তাই শেষে ঠিক করলুম যে আমার চলার পথে আমার চোখে-কানে-অনুভবে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা যেভাবে ধরা পড়েছে, যে পরিস্থিতিতে হঠাৎ কোনও তথ্য জেনে আমি যেভাবে মুগ্ধ হয়েছি, সেই মুহূর্তগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাতে এ লেখা হয়তো অগোছালো হবে, শাণিত যুক্তিতর্কজালের ঠাসবুনোট সেভাবে ফুটে উঠবে না, কিন্তু ছোটো ছোটো বিস্ময়ে ঘেরা কোনও সান্ধ্য আড্ডার কথকতা তো হবে! সেটাই আমার উদ্দেশ্য।

তখন ক্লাস সিক্সে কী সেভেনে পড়ি। উত্তমকুমার বলতে অজ্ঞান। দূরদর্শনে 'বিকেলে ভোরের ফুল' দেখছিলাম। সুমিত্রাদেবীর লিপে 'কী গাব আমি, কী শুনাব' হচ্ছে। সিনেমার ভিতরে আড্ডার আবহে উত্তমকুমার সহ অন্যান্যরা গানটা শুনছেন, আর টিভির বাইরে আমি! পরিচালকের

নির্দেশে সুমিত্রাদেবী বারবার আটকে যাচ্ছিলেন 'তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা' এই লাইনটাতে এসে। শেষে উত্তমকুমার ধরিয়ে দিলেন, 'তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে— রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে'। লাইনটা শোনামাত্র যেন সময় স্তব্ধ হয়ে গেল। এর আগেও হয়তো জানতে-অজান্তে এই একই গান অনেকবার শুনেছি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়নি কখনও। চোখের সামনে থেকে টিভি, তক্তপোশ, মেঝে, দেয়াল, জানলা, মা, বাবা সব অদৃশ্য হয়ে গেল— 'অসীম আকাশ নীলশতদল'-এ যেন আমি ভেসে বেড়াতে লাগলাম আর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম সূর্য থেকে ফোটনকণারা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে যাচ্ছে— সমগ্র সৌরজগতের উৎস সূর্যের করুণাধারারই প্রকাশ যেন। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'পর্বের একটি গানের কলি কেউ তার প্রিয় নায়কের লিপে শুনে এরকম বিশ্বরূপ-দর্শন করবে, তা হয়তো কবি স্বপ্নেও ভাবেননি।

কাকতালীয় হলেও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আর কসমোলজি নিয়ে আমার আগ্রহ শুরু হয় ওই ঘটনার পর থেকেই।

পরের বছর বইমেলার ঠিক আগে আগে 'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম। 'থীমা' থেকে নতুন বই বেরোবে— পার্থ ঘোষের *বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষ: আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা*। কিনব কিনব করেও সেবছর কেনা হল না। বরং কিনে ফেললাম স্টিফেন হকিং-এর *A Brief History of Time*-এর বাংলা ভাষান্তর। শক্রজিৎ দাশগুপ্তের করা— *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। মহাবিশ্ব সম্পর্কে, তার উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে আমার তখন প্রচণ্ড কৌতূহল। গোগ্রাসে শেষ করে ফেললাম। *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* পড়তে পড়তেই মাঝে একদিন হঠাৎ *সঞ্চয়িতা* ওলটাতে ওলটাতে চোখ আটকে গেল *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতাটিতে। সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,

দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে।

কবিতার ছত্রে ছত্রে মনে হল একজন মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হঠাৎ কবি হয়ে গিয়েছেন, কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মহাকালের কবি সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী রচনা।

স্কুলে ভৌতবিজ্ঞান আর ইংরেজি পড়াতেন অজয়বাবু, আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকে একদিন ঘটনাটা বললাম। উনি বললেন, 'ওরে, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা সম্পর্কে জানতে হলে *বিশ্বপরিচয়* পড়।' যেমনি কথা, তেমনি কাজ। বিশ্বভারতীর অফিসে গিয়ে কিনে ফেললাম *বিশ্বপরিচয়* সহ বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বই। সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে উৎসর্গ করা *বিশ্বপরিচয়*-এর প্রুফ সংশোধন করেছিলেন রাজশেখর বসু। পরমাণুলোক থেকে নক্ষত্রলোক, ভূলোক থেকে সৌরজগৎ— কবির অবাধ অনায়াস বিচরণ দেখে কে বলবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন!

পরের বছর হাতে এল পার্থ ঘোষের বইটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংসর্গ থেকে কি নিস্তার আছে? একটি আশ্চর্য তথ্যের সম্মুখীন হলাম। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয় দ্রষ্টানিরপেক্ষতা নিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মানুসারে বস্তুর দ্রষ্টানিরপেক্ষ রূপ বলে কিছু হয় না, দ্রষ্টার পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে বস্তু না কি আক্ষরিক অর্থেই বিভিন্ন রূপে থাকে। কিন্তু আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, এই রূপান্তর আপেক্ষিক, দ্রষ্টা থাকুক বা না থাকুক বস্তুর একটি নিরপেক্ষ সত্তা থাকে। রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের এই মত

সমর্থন করেননি।

আইনস্টাইন: Truth, then, or Beauty, is not independent of Man?

রবীন্দ্রনাথ: No.

আ: If there would be no human beings any more, the Apollo of Belvedere would no longer be beautiful?

র: No.

আ: I agree with regard to this conception of Beauty, but not with regard to Truth.

র: Why not? Truth is realized through man.

এই 'কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট' রবীন্দ্রনাথই বোধহয় ভাবতে পারেন যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্য নয়, 'চেতনার রঙে'-ই পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

ক্লাস ইলেভেনে অতিরিক্ত পেপার নিলাম স্ট্যাটিস্টিক্স। পাঠ্যবই ছিল গুণ, গুপ্ত ও দাশগুপ্তের লেখা *বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স*। বইয়ের শুরুতেই দেখি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি:

I find it hard to cope with the spate of requests that I receive for names and testimonials. I must ask Prasanta to have statistics on children who were christened by me, to see what they have become in later life– how many have turned out to be murderers, how many to be thieves or robbers. And data need to be collected on my blessings, too. One will then have first-hand evidence of how valuable my blessings are.

যদিও রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেকে ব্যঙ্গ করেছেন, তবুও স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এখানে অস্ফুট থাকেনি।

কিছুদিন পর শখ জাগল *রবীন্দ্ররচনাবলী* পড়ার। বাবার কাছে ঘ্যানঘ্যান করে অবশেষে কপালে শিকে ছিঁড়ল। দেখলাম অফিস থেকে ফেরার পথে এক পেটি ভরতি করে সবকটা খণ্ড কিনে নিয়ে এল বাবা। তারপর আর আমাকে পায় কে? কলেজ থেকে ফিরে খেলতে যাওয়া, পড়তে বসা সব মাথায় উঠল— রোজ যেন নিয়ম করেই *রবীন্দ্ররচনাবলী*তে মুখ গুঁজে রইলুম বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কোনও এক অজানিত শক্তিচালিত হয়ে। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো ছুঁয়ে যেত রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসিক্ত ভাবনাগুলি। যেমন— *শেষের কবিতা*-য় লাবণ্য যখন অমিতকে জিজ্ঞেস করে যে 'অমিতবাবু' বা 'মিস্টার রয়' সম্বোধনটি চলবে কি না, তখন অমিত বলে, 'একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।' লাবণ্য বলে, 'দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।' অমিতের উত্তর: 'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।' রবীন্দ্রনাথের লেখায় নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র! শুধু নিউটনেই শেষ নয়, আইনস্টাইনও আছেন! লাবণ্য যখন বলে, 'সহজ নয়, সময় লাগবে।' অমিতের ত্বরিত জবাব: 'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ নেই; ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল।' এ যে স্পেশ্যাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি! রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে আমার ফিজিক্স-এর প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। মাস্টারমশাইরা কিন্তু বুঝতে পারলেন না এর রহস্য কী!

পঞ্চভূত পড়েও খুব মজা পেয়েছিলাম। সমাজ, মানুষ, সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পর শেষ অধ্যায়টির নাম ছিল 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল'। বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন, 'যে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের সর্বত্রই সেই এক নিয়ম প্রসারিত'।

একটু পরেই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: 'নিয়ম অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশে প্রসারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেখা হইতে অণুপরিমাণ ইতস্তত করিতে পারে না'। শেষে সব সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা: 'আমরা নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মকে যে ভালোবাসি তাহার একটা গোড়ার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে— সে স্বাধীন'।

রবীন্দ্ররচনাবলী তো সমুদ্র। অক্ষরে অক্ষরে আজও শেষ করে ওঠা হয়নি। তবে পরবর্তীকালে— কলেজজীবনে, কর্মজীবনে যখনই হাত দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিভাত হয়েছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে। হয়তো সব লেখাতে নয়— হঠাৎ কোনও গল্পে বা চিঠিতে বা প্রবন্ধে, জ্বলে উঠেছে স্ফুলিঙ্গের মতো।

তবে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনায় শুধুই বিমূর্ত তত্ত্বকথা ছিল না, জীবনে প্রায়োগিক দিকটিতেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন কবিপ্রবর। যেমন 'শিক্ষা' রচনাটির 'বিজ্ঞানসভা' পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রলাল সরকার যে উদ্দেশ্যে ওটি স্থাপনা করেছিলেন সেটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম জোর দিয়েছিলেন এই রচনাটিতে।

এই তো, সেদিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পেলাম আরেকটি বিস্ময়কর তথ্য। আমার শ্বশুরমশাই সরকারি চাকরির পাশাপাশি শখের হোমিয়োপ্যাথি চর্চা করেন। মাঝে মাঝেই হোমিয়োপ্যাথির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। কিছুদিন আগে ড. বলরাম জানার লেখা *সেলুলার থেরাপি* বলে একটি বইয়ের 'নিবেদন'-এর পরের পাতাটা খুলে আমার সামনে মেলে ধরেন উনি। পড়ে দেখি, সেখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বায়োকেমিক আর অ্যালোপ্যাথির তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিচারে বায়োকেমিককে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার তুলনায় উৎকৃষ্টতর মেনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন বিরলতম মানুষ, যাঁর ব্যক্তিত্বের একেকটি দিক নিয়ে গবেষণা করলে সারাজীবন কেটে যায়। সেই গবেষণা করার এলেম বা তাড়না কোনওটাই আমার নেই। তবে আমার সাধারণ জীবনচরিতে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী-ছায়ার সঙ্গে যদি আচম্বিতে সাক্ষাৎ হতে থাকে, যেমন অতীতে হয়েছে কয়েকবার— সেই আনন্দানুভূতিটিও কিন্তু অমূল্য— অন্তত আমার কাছে।

এখন আহবকাল পাবেন :—

শ্যামাচরণ বুক স্টোর্স অ্যান্ড স্টেশনার্স
গোষ্ঠতলা, কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪

আর্য
প্রযত্নে: অজয় দত্ত
ব্রহ্মপুর, বটতলা, কলকাতা-৭০০ ০৯৬

গড়িয়া টিচার্স বুক স্টোর্স (শপ নং ১৩)
সোনার বাংলা শপিং কমপ্লেক্স, ১৩০ বি, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৯ এবং
সম্পাদকীয় দপ্তরে